যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ জুলাই ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

যুগযুগ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলো উত্তর কলকাতার ঐতিহ্য। তবে নতুন জেনারেশনের কাছে এই ঐতিহ্য ব্যাকডেটেড। আর প্রোমোটার? তাদের নজরে পড়লেই পুরনো বাড়ি ভেঙে যেনতেনপ্রকারেণ সেখানে গজাবেই বিরাট বিরাট কমপ্লেক্স। কিন্তু পুরনো দিনের মানুষরা পুরনো জিনিস আগলে রাখতে চান। হয়তো তাঁদের সময়ে এই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি কনসেপ্টটা এত জনপ্রিয় ছিল না বলেই। দিন বদলেছে...'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি কনসেপ্ট' মেনে নিলেও সজাগ দৃষ্টি, বাড়ির দিকে কোনও প্রোমোটারের নজর পড়েনি তো?

ফোটো: **রাজশেখর পাল** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

ডলি বসু (অভিনেত্রী)

আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি কলকাতাতেই। আমি যে কলকাতায় বড় হয়েছি সে কলকাতা আর নেই। আমাদের গর্বের একটা জায়গা ছিল যে কলকাতার মানুষ, কলকাতার জীবন অন্য শহরের থেকে অনেক অন্যরকম। সেটা এখন আর নেই এটা আর পাঁচটা শহরের মতই একটা ইনসেনসিটিভ শহর হয়ে উঠছে।

তখন আমার ষোলো বছর বয়স বাবা মারা যাবার পর, আমি মাকে নিয়ে একা থাকতাম। ভয় কী জিনিস আমি জানতাম না। আমার পাড়ার দাদারাই আমার সব ছিল। এই সিকিউরিটিটাই এখন যেন হারিয়ে গেছে। মানুষের আচার-ব্যাবহার অনেক বদলে গেছে। আগে মহিলাদের আলাদা মর্যাদা দেওয়া হতো, এখন যা সব দেখি সত্যিই খুব খারাপ লাগে।

ইদানীং কয়েক বছরের মধ্যে যেটা দেখছি সেটা হল কলকাতাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটা প্রচেষ্টা চলছে যেটা খুবই ভালো। আমি সল্টলেকে থাকি। সল্টলেকের মিউনিসিপ্যালিটি অসম্ভব ভালো কাজ করছে। পার্কগুলো সব এখন খুব ইউজেবল হয়েছে। রাস্তাঘাটে লাইটের ব্যাবস্থাও ভালোভাবে করা হয়েছে। জঞ্জাল পরিষ্কারের ব্যবস্থাও খুব ভালো। কিন্তু আমাদের পলিউশন অসম্ভব বেড়েছে। চোখের সামনে পুলিশের গাড়িই এত কালো ধোঁয়া নিয়ে বেরিয়ে যায় কে কাকে আর কী বলবে! কারো কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই, উদ্বেগ নেই। অন্যান্য স্টেটগুলোতে প্লাস্টিক ব্যান হয়ে গেছে কিন্তু সেই আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করে যাচ্ছি। কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। প্রোমোটারির জন্য ছোট ডোবাগুলোকেও ফিল আপ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে একটা সচেতনতা ভীষণ দরকার। সরকারকে এ বিষয়ে একটা উদ্যোগ নিতেই হবে যাতে আমাদের জলাশয়গুলো বেঁচে থাকে।

আমি যখন ছোট ছিলাম গামবুট পরে জলের মধ্যে লাফালাফি করা, একটু নৌকো ভাসানো একটা খেলা ছিল। কিন্তু পাড়ার আশেপাশে তার জন্য আমাদের জমা জল খুঁজতে হতো। আর এখন পাঁচ মিনিট বৃষ্টি হতে হতেই জল জমে যায়। বৃষ্টি একটা আনন্দের জায়গা থেকে এখন আতঙ্কের জায়গায় পরিণত হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

মানবতার কোনও ধর্ম হয় না

সৌরভ মণ্ডল

বর্ষাকালটা চিরকালই প্রচণ্ড বিরক্তির। এমন ভোগান্তি আর কোনও সময়েই হয় না। ছাতার জল, পায়ের কাদা সব মিলিয়ে একটা বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড! ট্রেনে ওঠা থেকে নামা, এমনকী রাস্তা দিয়ে যে হাঁটব সেখানেও কি শান্তি আছে? বছর তিনেক হল সোম থেকে শনি আমার রুটিন সকাল সাতটায় বসিরহাট থেকে ট্রেন ধরে দমদম নেমে শ্যামবাজার। তারপর আবার বাড়ি ফেরা। আড়াই ঘণ্টা যেতে আড়াই ঘণ্টা ফিরতে। প্রথমদিকে মনে হতো বাড়িটাকে ঠেলে যদি খানিকটা এগিয়ে নিয়ে আসা যেত বোধহয় ভালো হতো।

রোজ আমার নির্দিষ্টই থাকে ফার্স্ট কম্পার্টমেন্টের সেকেন্ড গেট। সব লোকজনই চেনা। আমাদের গলিও নির্দিষ্ট। তবে সেইদিনটা ছিল একটা গণ্ডগোলের দিন। ছুটে এসে কোনওক্রমে ট্রেনটা ধরে লাস্টের আগের কম্পার্টমেন্টে উঠে দাঁড়ালাম। পরিচিত কেউ নেই। বসবার জায়গা পাইনি। কয়েকদিন ধরে প্রেসারটাও লো। মাথা ঘুরে যাচ্ছে যখন-তখন। তাই বসবার জায়গা পাওয়াটা খুব জরুরি ছিল। অগত্যা একরাশ বিরক্তি নিয়েই একটা গলির ভিতর ঢুকে দাঁড়িয়ে আছি। এই কম্পার্টমেন্টের ডেইলি প্যাসেঞ্জার অনেকেই আছে। তবে আলাপ নেই তাই ওদের কথাবার্তাই শুনছি। তাদের আলোচনা হঠাৎই রাজনীতি, বসিরহাটের দাঙ্গায় মোড় নিলে অংশ না নিয়ে পারলাম না। আলাপ হল অনির্বাণ, রুপম, সৌভিকবাবুরদের সাথে। তাঁদের ধারণার সাথে আমার ধারণা অনেকটাই মিলে যায়, হ্যাঁ কোনও কোনও ধর্মের মানুষ তীব্র সাম্প্রদায়িক হয়। নিজেদের বাইরে কিছুই ভাবে না। কথায় কথায় ততক্ষণে ট্রেন নিউ ব্যারাকপুর ছেড়ে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি শরীরটা ক্রমশ আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রেসারটা আবার ফল করছে। একজন উঠে বসতে দিলেন। ট্রেন তখন বিরাটি। চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলাম।

দমদম আসতেই সবাই তোড়জোড় শুরু করল নামবার জন্য। আমাকেও নামতে হবে। চোখের সামনে সব ঝাপসা দেখছি। কোনওক্রমে ট্রেন থেকে প্ল্যাটকর্মে পা দেব আর টাল সামলাতে পারলাম না। ওই যে পড়ে গেলাম, বেশ কয়েক মিনিট আমি আর কিছু জানি না। চোখ খুলে দেখলাম দু'চারজন লোক জড়ো হয়ে আছে আমার আশপাশে আর একটি কমবয়সি ছেলে আমার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। মুখ দেখে চিনতে পারলাম বসিরহাট থেকে আমার সাথেই ট্রেনে উঠেছিল। নাম জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল সিরাজ। বুকের ভেতরে যেন বাজ পড়ল। আমার বহু বছরের একটা ধারণাতে বিরাট ছেদ পড়ল। বসিরহাটের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কারণ-ফলাফল নিয়ে কিছু জানি না, তবে একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট হল যে, মানবতার কোনও ধর্ম হয় না।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ জুলাই ২০১৭

উত্তরের চার্টবাস্টার

সৈকত ঘোষ

কলকাতার শরীরে অনেকগুলো কলকাতা আছে, ঠিক যেমন একটা মানুষের মধ্যে অনেকগুলো মানুষ। এখন প্রশ্ন আসতে পারে খাবার-দাবার নিয়ে লিখতে বসে এসব কথা কেন? উত্তর একটাই— ভ্যারাইটি। একটু গুছিয়ে বলি: কলকাতাকে এক্সপ্লোর করতে গেলে, কলকাতার পাল্‌স বুঝতে গেলে আপনাকে পৌঁছে যেতে হবে উত্তর কলকাতার অলিতে-গলিতে। সেই পুরনো ইটের পলেস্তরা খসা বাড়ি, রাস্তার ধারে সিংহের মুখওয়ালা জার্মান জলের কল, এবড়ো-খেবড়ো ট্রামলাইন, পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান, রকের আড্ডা, গঙ্গার ঘাট...এই হল আদি কলকাতার ফ্লেভার। আর এই আদি কলকাতার সাথে মিলেমিশে আছে এক অনন্য স্বাদ। বাগবাজার ঘাট যাবার রাস্তায় লাইন দিয়ে বেশ কয়েকটি চায়ের দোকান, এখানকার চায়ের বৈশিষ্ট্য হল পিওর মোষের দুধের সরওয়ালা কাটিং চা। দশ টাকায় বড়, পাঁচ টাকায় ছোট ভাঁড়। এই চায়ের সাথে আছে অনেক গল্প, অনেক নস্টালজিয়া। কথায় কথায় চায়ের দোকানের মালিক, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলেও যার একটা কাঁচা চুলও দেখতে পাওয়া যাবে না, প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই সেই ভদ্রলোক উত্তমকুমারের একখানা ছবি দেখালেন। উত্তমবাবু নাকি এদিকে এলে তাঁর চা না খেয়ে ফিরতেন না। গল্প সত্যি বা মিথ্যে যাই হোক না কেন, মূলকথা আমি কিন্তু দাদুর কাটিং চা সাথে লেরো বিস্কুটের ফ্যান হয়ে গেলাম। এখন বাগবাজার ঘাটের দিকে এগোচ্ছি। চোখ গেল ঘটিগরমের দিকে। সামনে গঙ্গা, হাতে ঝালঝাল ঘটিগরম আর পাশে প্রিয়জন। এমন সময় হালকা বৃষ্টি এলে একেবারে রিফ্রেশিং অ্যাম্বিয়েন্স। সুতরাং ওয়েদারের ওপর ভরসা রেখে একবার বেরিয়ে পড়তে পারেন বন্ধুবর, তবে ছাতা কিন্তু মাস্ট। আর হ্যাঁ, বাগবাজার আসবেন আর তেলেভাজা না খেলে কি করে মান থাকবে বলুন তো? মন্টুদার নিরামিষ তেলেভাজায় সত্যি বলছি জাদু আছে মশাই। এখানকার বেগুনি, আলুর চপ বা ফাটা ফুলুড়ি এক কথায় লা-জবাব। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এখন যেখানে আছি সেটা শোভাবাজার রাজবাড়ির খুব কাছাকাছি। এখানকার রাস্তার একটি নামহীন দোকানের আমসত্বের জাম্বো সিঙ্গাড়া খেয়ে সন্ধে নামার আগেই মনটা খুশ হয়ে গেল। তবে সন্ধের কলকাতায় আর একটু মিরচি মশালা অ্যাড করতে চাইলে এখানকার স্ট্রিট-ফুচকা মাস্ট। আর খাওয়ার পর আপনিই বলবেন এ স্বাদের ভাগ হয় না।

যদি ধরে নিই এই পর্যন্ত সিনেমার প্রথম হাফ, তবে ইন্টারভেলের পরের অংশে অলি-গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় ওঠা যাক। একটা বিষয় কি জানেন উত্তর কলকাতার রুটম্যাপ অসম্পূর্ণ থেকে যায় 'মিত্র ক্যাফে'কে ছাড়া। এখানকার মটন কবিরাজি কাটলেট ওয়াল্ড ফেমাস। অবশ্য বাহারি মোগলাই, ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ চপকেও কোনও দিক থেকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। কেন শুধু নাম হি কাফি সেটা সন্ধেবেলা এখানকার লম্বা লাইন দেখলেই অনুমান করা যায়। যাইহোক আপনি যদি চপ মুড়ি ছেড়ে চিকেন ইতালিয়ানোর ফ্যান হন তাহলে বাগবাজারে আপনার ডেস্টিনেশন অবশ্যই বেকস ক্লাব। আর ১০০% বাঙালিয়ানা চাইলে গাঙ্গুরামের স্পেশাল রাধাবল্লভী, ছোলার ডাল সাথে মিষ্টি দই আপনার জন্য একেবারে পারফেক্ট কম্বিনেশন। উইকএন্ডে পেট ভরে ভুরিভোজের চিন্তা-ভাবনা করলে আপনাকে বেশ কয়েকটা অপশন দিতে পারি— শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে গোলবাড়ির কষা মাংস সাথে রিম্পির পোলাও আর শেষ পাতে সেন মহাশয়ের সন্দেশ। একেবারে টেস্টি ইয়াম্মি জমাটি খাওয়া-দাওয়া।

বাই দ্য ওয়ে খাবার-দাবারের ব্যাপারে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না বাঙালি মাত্রই একটু খুঁতখুঁতে। এই একটা ব্যাপারে সে কম্প্রোমাইজে নারাজ। সুতরাং স্বাদে ভেরিয়েশন চাই-ই চাই। আর এই ভেরিয়েশন নিয়ে হাজির হাতিবাগানের কষে-কষা। এখানকার দেরাদুন চালের ভাত, সাথে চিতল মাছের মুইঠা কবজি ডুবিয়ে খাবার জন্য আর কি বা বাহানা চাই। তবে বিরিয়ানি ভক্ত হলে আপনার জন্য আছে শ্যামবাজার আমিনিয়া। এখানকার স্পেশাল বিরিয়ানির গন্ধ আপনাকে বারবার টেনে আনবে। আর এসব পড়ে যিনি মনে মনে ভাবছেন শেষ বলে ছয় হাঁকানোর কথা তিনি, একবার ঘুরে আসতে পারেন সুতানুটি জাংশন থেকে। হট অ্যান্ড হানি গার্লিক চিকেন সাংহাই রাইস এবং কাজু নাট চিকেন— এক কথায় প্রেমে না পড়ে উপায় নেই...আর প্রেমের কথা উঠতেই মিষ্টিমুখ তো বনতা হে, তাই আপনার জন্য বেস্ট অপশন দারিখের লেডিকেনি...

প্রকৃতির শীতল আবছায়া নলবন

নেহা প্রধান

কলকাতাকে শুধু 'সিটি অব জয়' বলা হলে অনেক কিছুই বলা হয় না কারণ 'কলকাতা সিটি অব ইচ্ছেপূরণ'ও বটে। এখানে গড়ের মাঠের খোলা হাওয়া, আমহার্স্ট স্ট্রিটে পুরীর সমুদ্র (শুধুমাত্র বৃষ্টির দিনে), প্রিন্সেপ ঘাটে গঙ্গার ধারের সূর্যাস্ত, উত্তরের অলিগলিতে রহস্যে মোড়া ইতিহাসের হাতছানি এবং পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে উপাদেয় ভুরিভোজ— সবকিছুই পাবেন শহর কলকাতাতে। একই সঙ্গে, আপনার বিশেষ মানুষটির হাতে হাত রেখে নির্জনে ভবিষ্যতের একান্ত আলাপচারিতায়ও মেতে উঠতে পারেন। আবার হইহই করে দল বেঁধে বনভোজনের আনন্দও ভাগ করে নিতে পারেন এই শহরেই। তবে বনভোজন বা পিকনিকের প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তাহলে চলুন আজকে ঘুরে আসি কলকাতারই একটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পটে, তথা নলবনে।

শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রায় ১২ কিমি দূরে সল্টলেক উপনগরীর মধ্যস্থলে ৪০০ একর জলাভূমি এবং তৎসংলগ্ন বনাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে নলবন। নল শব্দের অর্থ হ্রদ এবং বন অর্থাৎ বনানী। তাই এই দুইয়ের যথার্থ সহাবস্থানে এই সুবিশাল জলাভূমির নাম রাখা হয়েছে নলবন। এককালে শহরের নিকাশি-নালা হিসাবে ব্যবহৃত হতো এই অঞ্চল। পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই বিশাল জায়গাটিকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কারের পর প্রমোদ উদ্যানে রূপান্তরিত করা হয়। নলবনে রয়েছে হ্রদে জলবিহারের হরেক রকম ব্যবস্থা। শিকারা, প্যাডেল বোট, রোয়িং বোট, হোভারক্রাফ্ট— কী পাবেন না এখানে! অল্প টাকার বিনিময়ে আপনি বেছে নিতে পারেন আপনার পছন্দসই জলযান। আর তার চেয়েও বড় প্রাপ্তি নৌকাবিহারের সাথে প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়া শীতল হাওয়া। কলকাতার ধুলোবালি আর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া গরম থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেতে চলে আসতে পারেন এখানে, কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত হলেও প্রকৃতির শীতল আবছায়া আপনাকে তার অমোঘ হাতছানি দিয়ে আকর্ষণ করবেই।

আসতে পারেন দলবেঁধে বনভোজনেও। লেকের চারপাশে বেশ কিছু পিকনিক স্পট আছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে হইহুল্লোড়, খেলাধুলা, লেকের জলে বোটিংয়ে জমে উঠবে দিন, সেইসঙ্গে উপরি পাওনা শহরে বসেই বিস্তীর্ণ, নিরিবিলি সবুজ বনাঞ্চল। তবে আগে থেকে যোগাযোগ করে স্পট বুকিং করে রাখলে ভালো হয়, কারণ শহরবাসীর কাছে নলবনের চাহিদা প্রচুর।

পেটপুজোর ব্যবস্থাও ঢালাও নলবনে। লেকের ধারে অতি মনোরম ও নয়নাভিরামভাবে সজ্জিত ফুডকোর্টে বসে ইচ্ছেমতো উপাদেয় খাবার ও নানান রকমের পানীয় সহযোগে গা এলিয়ে উপভোগ করতে পারেন চারপাশের সবুজ প্রকৃতি ও বিশাল জলাভূমির শান্ত সৌন্দর্য। মানে এক কথায় আপনি প্রকৃতিপ্রেমিকই হোন বা নিতান্তই শহরের একঘেয়েমি থেকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে থাকতে চান, এখানে এসে সবুজ প্রকৃতির নির্জন আবছায়ায় আপনার মুড ভালো হতে বাধ্য। আফটার অল বাঙালি আড্ডাপ্রিয় জাতি। একান্তে বসে লেখালিখি করতে বা ছবি আঁকতে চাইলেও বাধাই-বা দিচ্ছে কে? হলফ করে বলা যায় আগে কখনও এখানে যদি না এসে থাকেন, একবার নলবন বোটিং কমপ্লেক্স ঘুরে গেলে বারবার আসতে মন চাইবে।

বিভিন্ন ঘরোয়া অনুষ্ঠানে যেমন বিয়ে, রিসেপশনের পার্টি বা কোনও ইভেন্ট যেমন মিউজিক কনসার্ট, ফেস্টিভ্যাল ইত্যাদির জন্য নলবনের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা ভাড়া দেওয়া হয়। তাই প্রায়শই জনসমাগম দেখতে পাওয়া যায় এখানে। যাতায়াতের মাধ্যম খুবই সহজ, শহরের যে কোনও প্রান্ত থেকেই নিমেষে নলবন পৌঁছানোর সুবিধা রয়েছে। সল্টলেকে প্রবেশের মুখ থেকেই নলবনগামী বাস, অটো, ট্যাক্সি, ই-রিকশা পাওয়া যায়।

কলকাতার অন্যান্য প্রমোদ উদ্যানগুলির তুলনায় নলবন অনেক বেশি শান্ত ও নিরিবিলি। প্রচুর মানুষ এখানে আসেন প্রকৃতির কোলে একান্তে কিছু সময় কাটাতে। শহরের কংক্রিটের জঙ্গল থেকে মুক্ত অথচ শহরেরই প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, সবুজ গাছগাছালিতে মোড়া বিশাল হ্রদ নিয়ে গড়ে ওঠা এই প্রমোদ অঞ্চলের আকর্ষণ দিনে দিনে ক্রমবর্ধমান। কী ভাবছেন? একবার চট করে ঢুঁ মেরে আসবেন? তবে আর দেরি কেন? নলবন ঘুরে আসতে পারেন আজই। নলবন সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে অর্থাৎ সোম থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৮:৩০টা পর্যন্ত খোলা এবং সপ্তাহান্তে শুক্র থেকে রবি সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা অবধি জনসাধারণের জন্য অবারিত দ্বার।

সন্ন্যাসীর চিঠি

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

আজকাল দু-এক পা হাঁটলে বুকে ব্যথা করে স্বামী বিবেকানন্দের। কোনও খাবার হজম হয় না। মাথায় সব সময় যেন বাঁধা রয়েছে একটা ভারী পাথর। সারা রাত ঘুম হয় না হাঁপানিতে। ভোরের আলো ফোটার আগে তিনি শয্যা ত্যাগ করেন। সকালে ঘুমোনো সন্ন্যাসীর পক্ষে বেমানান। সমস্তরকম আলস্য ত্যাগ করতে হবে সন্ন্যাসীকে। কারণ আলস্য একপ্রকার লঘু আমোদ বা আরাম ছাড়া আর কিছু নয় স্বামীজির কাছে।

ভোরবেলা উঠে তিনি পড়াশোনা করেন। তানপুরা নিয়েও বসতেন আগে। এখন তাঁর গলায় আর সুর আসে না। পড়তেও এখন তাঁর কষ্ট হয়। একটা চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। বেলুড়ের গঙ্গা তাঁকে টানে। ভোরবেলায় গঙ্গাতীরের বাতাস যেন মায়ের মতো স্নেহময়ী। স্বামীজির রোগজর্জরিত শরীরটা যেন জুড়িয়ে যায় গঙ্গা তীরবর্তী বাতাসের স্পর্শে।

স্বামীজি মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকেন। তাঁর অনেক কাজ অসমাপ্ত রইল। কিন্তু তাঁকে এবার যেতে হবে। তাঁর জীবনপ্রদীপ আর বেশিদিন জ্বলবে না তিনি জানেন। যাবার আগে সবার সঙ্গে সব মান-অভিমান মিটিয়ে যেতে পারলে কত ভালো হতো। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে সোসাইটিতে নানা ফিসফাস চলে। লোকে বলে নিবেদিতাকে ঠাকুরবাড়ির লোকজন খুব শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে ওদের একটা অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেই দ্বন্দ যে কেন তার আসল কারণ প্রায় কেউই বোঝে না। ঠাকুরবাড়ির যে জীবনযাপন, যে পথের তাঁরা পথিক সেই পথ কখনওই নিরন্তর বৈরাগ্য সাধনার সঙ্গে মিলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভালো লাগে স্বামীজির। তবে তাই বলে সব কবিতা নয়। ওঁর কিছু কিছু কবিতা পড়লে মনটা শ্মশানের মতো নির্লিপ্ত হয়ে ওঠে। স্বামীজি মানেন যে খুব বড় মাপের কবি ছাড়া এমন বৈরাগ্য কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রের কিছু কিছু কবিতা যেন আকণ্ঠ শৃঙ্গার রসে নিমজ্জিত। স্বামীজি অবাক হন। শেলি, বায়রন, কিটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন এঁদের লেখা যখন পড়েন তখন দেখেন এঁরা যা লিখছেন তার একটা নির্দিষ্ট ঘরানা রয়েছে। কিটস যেভাবে সুন্দরের মধ্যে ডুবে গিয়ে সুন্দরকে হাতের মুঠোয় ধরতে চাইবেন; যেভাবে ইন্দ্রিয় দিয়ে সুন্দরকে উপভোগ করতে চাইবেন, সেটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ কখনওই করবেন না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ দূর থেকে সুন্দরকে দেখবেন নির্লিপ্ত ধ্যানীর দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে এই লোকটি যাঁর কবিত্ব স্বামীজিকে চমকে রাখে সেই তিনি যে কোন ধাতুর কবি স্বামীজি বোঝেন না। একটা মানুষ তিনিই এমন লেখা লিখছেন তাতে যেন তিনি ঘোর মহাকালের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাচ্ছেন। আবার তিনিই যখন কোনও নারীর রূপ বর্ণনা করছেন তখন যেন মনে হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের সুরসভায় তিনি ডাক পেয়েছেন ভোগের রসে ত্রিভুবনকে ডুবিয়ে দেবার জন্য। এত বৈপরীত্য একজন মানুষের মধ্যে কীভাবে আসে! মাঝে মাঝে ভাবেন স্বামীজি। নিবেদিতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির একটা গভীর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে অনেকদিন ধরেই। নিবেদিতা এদেশের রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়েছেন ঠাকুরবাড়ির অঙ্গন থেকেই। স্বামীজি নিবেদিতাকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা সন্ন্যাসী, রাজনীতি তাঁদের মার্গ নয়। তিনি এটাও বলেছেন নিবেদিতার ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে রামকৃষ্ণ মঠেরও ক্ষতি হতে পারে। নিবেদিতা মঠের সঙ্গে যুক্ত। ফলে যদি নিবেদিতা ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত হন তাহলে ব্রিটিশ পুলিশের নজর পড়তে পারে মঠের ওপর। কিন্তু নিবেদিতাকে রাজনীতি থেকে সরানো গেল না। ভারতকে ভালোবেসে পরাধীন ভারতের গ্লানি ও মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু দেশ স্বাধীন করা তো সন্ন্যাসীর কাজ নয়। ইংরেজ-ভারতীয় ভেদভাব করাও সন্ন্যাসধর্ম হতে পারে না। সমাজের অধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন আর নিজের মোক্ষ— এই তো সন্ন্যাসীর নিজস্ব ধর্ম।

কিন্তু মার্গটিকে কিছুতেই বোঝানো গেল না। সে ব্রিটিশ বিরোধী তরুণ বিপ্লবীদের সাহায্য করে। চাঁদা তোলে বিপ্লবীদের জন্যে। ব্রিটিশ বিরোধী ইস্তেহার লেখে।

মঠের অন্য সন্ন্যাসীরা স্বামীজির কাছে প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। নিবেদিতাকে স্বামীজি মঠে নিয়ে এসেছেন। এখন নিবেদিতার উগ্র রাজনৈতিক কার্যকলাপে মঠের ওপর যদি পুলিশের চোখ পড়ে তখন কী হবে? রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন সারা পৃথিবীর। তার গায়ে কেন লাগবে দেশীয় রাজনীতির রং? এইসব প্রশ্ন নিয়ে স্বামীজির কাছে ভেঙে পড়লেন আশ্রমিকরা। স্বামীজিকে শক্ত হতে হল। তিনি জানালেন হয় নিবেদিতাকে রাজনীতি ছাড়তে হবে, নয়তো চিরতরে ত্যাগ করতে হবে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ককে। নিবেদিতা মাথা নিচু করে জানালেন: তাঁর ওপর এখন অনেক তরুণ বিপ্লবী নির্ভর করছে। তিনি তাঁদের মাতৃসমা। সেই বিপ্লবীরা তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলে নিবেদিতা পারবেন না তাঁদের তাড়িয়ে দিতে। স্বামীজি হাতের অথর্ব বেদটা বন্ধ করলেন। এই তোমার শেষ সিদ্ধান্ত মার্গটি? নিবেদিতা মাথা নিচু করে রইলেন। স্বামীজির গলা যেন একটু কেঁপে উঠল। 'তাহলে আমারও একটা সিদ্ধান্ত তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি মার্গট। তোমার রাজনীতি করা নিয়ে মঠের ভেতরে বিক্ষোভের ঝড় উঠছে। তোমার জন্যে মঠের নিরবচ্ছিন্ন জীবনে যে কোনও সময় নেমে আসতে পারে ব্রিটিশ পুলিশের ভয়ানক থাবা। তাই তুমি যখন সক্রিয় রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করতে পারবে না, তখন তোমাকে রামকৃষ্ণ মঠ আর মিশনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।' হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজি। তিনি থামলেন। দম নিলেন। 'মঠ তোমাকে ছাড়তে হবে। আর পরিত্যাগ করতে হবে আমাকেও। আমার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না তোমার। তুমি ভালো থাকো। নিজের কাজে সফল হও।'

তারপর বছর প্রায় ঘুরে গিয়েছে। নিবেদিতা নীরবে মঠ ছেড়েছেন। স্বামীজির সঙ্গেও আর যোগাযোগ করেননি। স্বামীজি শুনতে পান মার্গট নাকি এখন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সে পুরোপুরি সমর্পিতা।

আর বেশিদিন সময় নেই স্বামীজির হাতে। মার্গটের সঙ্গে এমন একটা কঠিন বিচ্ছেদ বুকে নিয়ে পৃথিবী ছাড়তে হবে স্বামীজিকে? মুখে তিনি যাই বলুন অন্তরে নিবেদিতাকে এখনও যেন তাঁরই দীক্ষিত শিষ্যা মানেন। নিবেদিতার প্রতি গভীর স্নেহবোধ তিনি এড়াতে পারেন না। নিজের সন্তানের মতো এক সময় আগলে রেখেছেন মার্গটকে।

দুপুরবেলা প্রায় কিছুই খেতে পারলেন না স্বামীজি। বুক জ্বলে যাচ্ছে তাঁর। গলা দিয়ে খাবার নামছে না। শরীরের কষ্টকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন তিনি।

আহ্নিক সেরে একটা চিঠি লিখতে বসলেন। বহুদিন পর নিবেদিতাকে চিঠি লিখছেন তিনি।

হাত কাঁপছে। আজ তিনি শুধু একবার নিবেদিতাকে দেখতে চেয়ে চিঠি লিখছেন। চিঠিটি সেদিনই পিয়নের হাত দিয়ে নিবেদিতার ১৬ নম্বর বোসপুকুর লেনের বাড়িতে চিঠিটি পাঠিয়ে দিলেন স্বামীজি।

নিবেদিতা চিঠিটি হাতে নিয়ে বারবার পড়তে লাগলেন।

বোসপুকুরে তাঁর বাড়িতে সারাদিন-রাত কত কথা, কত কাজ এসে ভিড় করে। নিবেদিতা অন্তরে অন্তরে কতটা চুরমার হয়ে গিয়েছেন সেটা বাইরে থেকে তাঁকে দেখে বোঝা যায় না। তিনি মাঝে মাঝে মনে করেন ছুটে গিয়ে তাঁর প্রভুর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু স্বামীজি তাঁকে নিজে বলেছিলেন: আমার সঙ্গে এবং মঠের সঙ্গে আজ থেকে তোমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হল। আমি তোমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি ভবিষ্যতে আর কখনও আমাদের শান্তি বিঘ্নিত করতে তুমি এখানে এসো না।

এই কথা শুনে আর কোনও উত্তর দিতে পারেননি নিবেদিতা। কান্না চেপে শহরের রাস্তা দিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরেছিলেন। তারপর প্রতিটি দিনকে তাঁর যেন মনে হয়েছে অর্থহীন। প্রতিটি রাতে লুকিয়ে একা একা কেঁদেছেন।

এতদিন পর আজ স্বামীজির এই চিঠি এসেছে। আসছে রবিবার স্বামীজি তাঁকে ডেকেছেন বেলুড়ে নিজের ঘরে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না নিবেদিতা।

রবিবারে তাঁর নিজের অনেক কর্মসূচি ছিল। সমস্তই বাতিল করবেন নিবেদিতা। তাঁর গুরুর থেকে ডাক এসেছে তাঁর কাছে। জগতের বাকি সব কিছু যেন কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছে বিবেকানন্দের এই চিঠি। ১৬ নম্বর বোসপুকুর লেনের বাড়িটি যেন গভীর আনন্দে গমগম করে উঠছে। নিবেদিতা চিঠিটির ওপর হাত বোলালেন। একটি চিঠি আজ যেন তাঁকে কোনও এক অদৃশ্য কারাগার থেকে মুক্তি দিল। চিঠিটি হাতে নিয়ে সারারাত ঘুমোতে পারলেন না নিবেদিতা।

ইংরেজ-ভারতীয় ভেদভাব করাও সন্ন্যাসধর্ম হতে পারে না। সমাজের অধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন আর নিজের মোক্ষ— এই তো সন্ন্যাসীর নিজস্ব ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা

বেলুড় মঠ

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ জুলাই ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৪ জুলাই ২০১৭

হারিয়ে যাওয়া কলকাতার ফুরিয়ে যাওয়া নেশাগুলি

ইমন মুখোপাধ্যায়

তিলোত্তমা কলকাতা। বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিনিয়ত পালটে যাচ্ছি আমি, আপনি। বদলে যাচ্ছে আমাদের চেনা শহরটাও। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পালটে যাচ্ছে কলকাতার মানুষের পরিচিত নেশাগুলিও। আগে কলকাতার নেশা বলতে মানুষ পরিচিত ছিল, আফিম, নস্যি, হুঁকো বা গুড়াকুর সঙ্গে। এর কতগুলি ছিল আবার রীতিমতো বনেদিয়ানার লক্ষণ। কিন্তু কালক্রমে বিশ্বায়নের দোলায় ক্রমশই বদলে যাচ্ছে এগুলি। অবাঙালিদের হাত ধরে এসে পড়েছে গুটখা, পান মশালা, খৈনি, এছাড়া সাবেক বিড়ি ও সিগারেট তো আছেই। তবে পাসিং শো, ক্যাপস্টানদের সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে গোল্ড ফ্লেক-ক্লাসিকরা। ব্যতিক্রম বলতে 'ভগবানের প্রসাদ' গঞ্জিকা বা গোদা বাংলায় 'গাঁজা'। সে সৃষ্টির সেই গোড়া থেকে নিজের উইকেট ধরে রেখেছে। কিন্তু তারও সেবনের পদ্ধতি বদলেছে। ড্রাগসজনিত মারণ নেশাগুলির কথা না হয় বাদই দিলাম।

কেমন ছিল সেই অতীতের নেশাগুলি? পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের কাছে এই প্রশ্ন রাখার আগে চলুন আমরাই স্মৃতির সরণি বেয়ে খানিকটা হেঁটে নিই। প্রথমেই আসা যাক আফিমের কথায়। ইতিহাসে এই এমন একটাই নেশা রয়েছে যার স্বত্ব ঘিরে একটা আস্ত যুদ্ধ হয়েছে। আর এই কলকাতাই ছিল সেই আফিমের রাজধানী। এই বিষয় নিয়ে যাঁদের পড়াশোনা রয়েছে তাঁরা জানেন, 'ক্যালকাটা ওয়াজ দ্য ওপিয়াম ক্যাপিটাল অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি।' কলোনিয়াল সিলেবাসের ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে যাওয়া আফিমের গল্প শুরু ব্রিটিশ ভারতের ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বিহারে, আর শেষ চিনে। আজকের চিন নয়। চিন তখন আফিমখোর ঘুমন্ত জাতি। বিহারের পাটনার ফ্যাক্টরিতে তৈরি হতো আফিমের দলা, যার নাম 'বেঙ্গল মাড'। বাংলায় জন্ম নয় বটে, তবে তার ব্যবসা-বাণিজ্য সবই কলকাতার আলিপুরের অকশন হাউস-এ। এখন যেমন চা অকশন হয়। সেরকম আফিমের নিলাম হতো। এখান থেকেই আফিম কিনে ব্রিটিশ কোম্পানির সাহেবরা পাড়ি দিত চিনে। জাহাজ খালাস করে কিনে নিত সাংহাইয়ের দোকানিরা। তারপর ডিঙি নৌকো চড়ে আফিম পৌঁছে যেত চিনের মূল ভূখণ্ডের ঘরে ঘরে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে গোটা জাতটাকে নেশাখোর বানিয়ে ফেলেছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসক ও কলকাতার বেনিয়া গোষ্ঠী। এমনই এই ব্যবসা, যার মন্ত্র একটাই— আফিম খাও আর ব্রিটিশ-ভারতীয় কোম্পানির লাভ বাড়াও। আমি খাবো না, তোমরা খাবে। আমি শুধু চাই লাভ! শকুনের লোভাতুর চোখের মতো লাভের লাভাস্রোত। শুধু ব্যবসায়ী নয়, আফিমের রঙিন দুনিয়ায় ভিড় জমিয়েছিল আরও অনেকেই: নেশাখোর, জাহাজের কাপ্তান ও খালাসি, বিবিধ ষড়যন্ত্রী, পাদরি, কেরানি, গুপ্ত বিপ্লবী, বারবনিতা, ব্যর্থ প্রেমিক, বেশ্যার দালাল, ফতুর জমিদার ও পলাতক খুনি। ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও বাংলায় তথা কলকাতায় আফিমখোরেরা ছিল। আর সেই নেশা যেরকম সমাজের নিচুস্তরের মানুষের মধ্যে ছিল, সেরকম উঁচুস্তরের মানুষের মধ্যেও ছিল। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক জামবাটি দুধে দুটো আফিমের বড়ি খাওয়ার রীতিমতো প্রথা ছিল সেই ষাটের দশক, এমনকী সত্তরের দশকের প্রথম দিকেও। প্রধানত বাড়ির কর্তারাই করতেন এই নেশা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সমসাময়িক একাধিক সাহিত্যিকের লেখার মধ্যেই এই নেশার প্রচুর উদাহরণ পাই আমরা। কিন্তু কালের দাপটে আধুনিকতার প্রভাবে ক্রমশ হারিয়ে গেছে এই নেশা।

এরপর আসি নস্যির কথায়! আহ্ যাঁরা এই নেশা করেছেন তাঁরাই এর সুখ জানেন। রুপোর কৌটো থেকে উঠে আসে কালচে হিরে বর্ণের অমোঘ বস্তু। একসময় কেরানি থেকে মাস্টারমশাই, মাঝারি ব্যবসায়ী সবার পকেটেই বাধ্যতামূলক ছিল একটি করে নস্যির ডিবে। আর তার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে একটি করে রুমাল। আবার অনেকের ছিল নস্যি দিয়ে দাঁত মাজার নেশাও। এর একটা সুবিধা ছিল এই বস্তু কোনওদিনই মহার্ঘ্য বা দামি ছিল না। যে প্রথম এই নেশা করতে শুরু করত প্রথম প্রথম একটু চোখে ঘোর লাগা 'লালচে' ভাব এলেও অল্পদিনেই সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠত। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিলুপ্তপ্রায় বাঘের মতো নস্যিজীবীরাও ক্রমহ্রাসমান এই শহরে। তাঁদেরও সংরক্ষণ দরকার।

এর মধ্যে আরেকটি নেশার কথা যা উল্লেখ না করলেই নয়। তা হল গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজা। আগেকার দিনে মা, মাসি, পিসিদের মধ্যে এ নেশা হামেশাই দেখা যেত। যে সময়ের কথা হচ্ছে সে যুগে মোবাইল আসেনি। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে জিনস পরার ঢল নামেনি। পাবে গিয়ে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তির চলও ওঠেনি। সারাদিন সংসারের হাড়ি ঠেলে সন্ধ্যার পরে সেটাই ছিল তাঁদের একমাত্র এন্টারটেনমেন্ট। খরচ দৈনিক দশ থেকে পনেরো পয়সা। এই দাঁত মাজতে মাজতেই চলত তাঁদের পরনিন্দা-পরচর্চা। শাশুড়ি, জা, ননদ বা বউমার উদ্দেশে তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ। সেদিন আজ আর নেই। সারাদিন অফিসের পরে আধুনিক বঙ্গনারীর পরনিন্দা এখন শোভা পায় ফেসবুকের স্ট্যাটাসে।

এর পরে যে জিনিসটার প্রসঙ্গে আসব, তার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্ম অনেকটাই পরিচিত। কথা হচ্ছে হুঁকোর প্রসঙ্গে। না না আজকের দিনে চড়া মিউজিক মার্কা হুক্কা বারের হচ্ছে না। হচ্ছে সেকেলে গড়গড়ার কথা। 'গড়গড়ার মা-লো, তোর গড়গড়াটা কই! হালের গরু বাঘে খেয়েছে পিঁপড়ে টানে মই'। ছোটবেলায় পড়া এই ছড়াটি এখনও অনেকের মুখস্থ। বাংলার কয়েকটি হাতেগোনা গ্রামের মানুষের মধ্যে এখনও সেই থেলো হুঁকোয় তামাক খাওয়ার চল রয়েছে। নারকেলের খোলের সঙ্গে আড়াআড়ি নলের আগায় তামাক রাখার ছোট পাত্র আর তার ওপর পোড়ামাটির খুদে মালসায় টিকলি জ্বালানোর ব্যবস্থা। নারকেল মালার অন্য এক দিকে অপেক্ষাকৃত খাটো নল জুড়ে দেওয়া। টিকলির আগুনে তামাক তেতে উঠলে তার নিচের নল বেয়ে ধোঁয়া নামে। সে ধোঁয়া নারকেলের খোলের ভেতরে থাকা জলে পরিশুদ্ধ হয়। ছোট নলের মুখে ঠোঁট চেপে টানতে হয় সেই পরিশুদ্ধ ধোঁয়া। সে সময় কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে কর্তা ও তাঁর ইয়ার-দোস্তদের জন্য থরে থরে সাজানো সে বস্তু। আর সে কী বাহার! কোনওটার নল লম্বা সরু আবার কোনওটার নল ছোট মোটা। বড়লোকদের হুকোগুলি হতো রুপোর অথবা পেতলের। কর্তাবাবুদের তো আবার সোনার! তামাকটিও থাকত উঁচুদরের খাসা অম্বুরি তামাক। আসলে সে যুগে সেটাই ছিল নিজের স্ট্যাটাস প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম। এক এক জাতের জন্য এক একটি হুঁকো বরাদ্দ থাকত। বামুনের জন্যে আলাদা, কায়েতের জন্য আলাদা। আবার বদ্যির জন্য অন্যটি। কলকাতার দেউলটির বাড়িতে এখনও রাখা রয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গড়গড়া। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি গল্প অনেকেরই জানা। নরেন্দ্রনাথ তখনও স্বামীজি হয়ে ওঠেননি। সেই বিলেই রয়েছেন। তাঁর বাবা বৈঠকখানায় অনেকগুলি হুঁকো রাখতেন। যাতে একজনের খাওয়া হুঁকো মুখে দিয়ে অন্যের জাত না যায়। একদিন বিবেকানন্দ সবগুলো হুকোয় একবার করে টান দিলেন। ''এ তুমি কি করলে?'' জিজ্ঞাসু স্বরে ওঁনার বাবা জানতে চাইলে, তিনি বলেন, ''দেখলাম জাত যায় কিনা।'' কত ছেড়ে কত বলব! মা-কাকিমাদের সেই হাতে কাটা-হামানদিস্তায় থেঁতো করা পান নেই। বাবা-জ্যাঠাদের পাঞ্জাবিতে সেই আতরের গন্ধ নেই। গল্পবলা দাদুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে সেইদিনগুলিও। গাঁজার ছিলিমের বদলে এসে সিগারেটে ভরে পাতা খাওয়ার চল। বিহারিদের হাত ধরে বাঙালি যুবকের ঘরে ঢুকেছে খৈনি। দু-আনার পাসিং শো বদলে গিয়েছে ১২০ টাকার গোল্ড ফ্লেকে। লম্প চালানো খুপরিতে সিগারেটের প্যাকেট কুচি কুচি করে কাটা থাকত। সিগারেটকে প্রেমিকার ওষ্ঠ মনে করে হালকা করে ঠোঁটে লাগিয়ে হালকা করে ধরাতে হতো। কিন্তু সেইদিন আর নেই। হারিয়ে যাওয়া কলকাতা থেকে সেগুলিও ফুরিয়ে গেছে। পরিশেষে বলি, কোনওরকম নেশার পক্ষে কিন্তু এই প্রতিবেদক নয়। নেশামুক্ত সমাজই যুবসমাজের এগোনোর হাতিয়ার বলেই সে মনে করে। শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'নেশা যদি করতেই হয়, তাহলে রাবড়ির নেশা করব।' কিন্তু এগুলো ওই যে 'নস্টালজিয়া'! নইলে আর বাঙালি কী নিয়ে বাঁচে বলুন!

‘শহিদ দিবস’ পালনের উদ্দেশ্য— শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, নাকি রাজনৈতিক ফায়দা তোলা?

বিপাশা চক্রবর্তী

রাজনৈতিক বাদানুবাদ, বিরোধীদের কটাক্ষ, সব কিছু উপেক্ষা করে ফের মহাসমারোহে পালিত হল তৃণমূলের শহিদ দিবস ২১ জুলাই। প্রত্যেক বারের মতোই এবারে ভিড় ছিল উপচে পড়ার মতো। ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে ১৩ জন মানুষের নিহত ও অসংখ্য মানুষের আহত হওয়ার ঘটনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজও দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেদিনের সেই ঘটনায় আহত হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি অবশ্য সেই সময় ছিলেন জাতীয় যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী। সেই সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। তৎকালীন সরকারের নির্দেশে পুলিশের এই নক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই সময়ও এই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। এর পর অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। পরে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেত্রীর আন্দোলন জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার ফল স্বরূপ ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বাম যুগের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল আসন দখল করে।

বর্তমানে নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বর্তমান রাজ্য-রাজনীতি। ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস পালনের ঘটনা সেই উত্তাপের পারদকে আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিল রাজনৈতিক মহলে।

শহিদ দিবস পালনের ঘটনা নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো মন্তব্য করতে পিছুপা হননি রাজনৈতিক দলগুলি। বিরোধীদের কটাক্ষ শহিদ দিবস একটি প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। তৃণমূলের কাছে শুধুমাত্র এটি একটি রাজনৈতিক ফায়দা তোলার মাধ্যম।

সুজন চক্রবর্তী (বাম পরিষদীয় দলনেতা): ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। যা এরা প্রত্যেক বছরই পালন করে থাকে ধুমধাম করে। এই অনুষ্ঠানে গান, কৌতুক সবই অনুষ্ঠিত হয়। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর থেকে রাজনৈতিক গুরুত্বই বেশি, যা আমরা প্রত্যেক বছরই দেখে থাকি। একে শ্রদ্ধা জানানো না বলে, উৎসব বলাই ভালো।

রাহুল সিনহা (বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক): এটি একটি রাজনৈতিক উৎসব, শহিদ দিবস নয়। শুরুতে শহিদ দিবস ছিল, বর্তমানে এটি একটি ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ২১ জুলাই যাঁরা ঘটিয়েছে, যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা এখন সবাই তৃণমূল কংগ্রেস। অর্থাৎ খুন যারা করল, শহিদ যারা বানাল, তারা এখন তৃণমূল কংগ্রেসের মাথা। আমি মনে করি যে, যাঁরা দলের আদর্শে লড়াই করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন রাজ্যের তৃণমূল নেত্রী বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওমপ্রকাশ মিশ্র (কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক): এই দিনটিতে শহিদ দিবসের সঙ্গে শ্রদ্ধা জানানোর কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল ক্ষমতায় আছে ছ’বছর ধরে। ২১ জুলাই যারা হত্যালীলা সংঘটিত করেছিলেন, বহাল তবিয়তে মন্ত্রিসভায় তাঁরাই থেকে গেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস এই দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য। এটি হচ্ছে তাদের একটি রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী): যাঁরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিনটিকে উৎসব বলতে পারেন, তাঁরা ওই কালচারেই বিশ্বাস করেন। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় এমন কোনও রাজনৈতিক দল নেই, যারা আন্দোলনে নিহত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে। একটা সময় সিপিএম-কে দেখেছি ভূদেব সেন-এর মৃত্যুতে ওই একবার-দু’বার শহিদ দিবস পালন করেছে, তাও যখন রাজনৈতিক প্রয়োজন পড়েছে তখন। ডনবস্কো স্কুলের পাশে যে শহিদ বেদি ছিল সেটিও এখন কুকুরের প্রস্রাব করার জায়গা হয়েছে। এখন আর ওখানে কেউ যায় না।

এছাড়াও নুরুল ইসলাম গুলিতে মারা গিয়েছিলেন। সেই নুরুল ইসলামের পরিবারকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি দিয়েছেন এবং বাড়িও করে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই একজন মানুষ যাঁর উদ্দেশ্যে হল গণআন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের পূর্ণবাসন দেওয়া। যত মানুষ গণ আন্দোলনে মারা গেছেন, তাঁদের পাশে কোনও না কোনওভাবে আমাদের নেত্রী বা তৃণমূল কংগ্রেস দাঁড়িয়েছে। গণ আন্দোলনে নিহত প্রতিটি পরিবারের মানুষকে চাকরি দিয়ে বা বাড়ি করে দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

তবে ২১ জুলাই যে সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে তা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথোপকথন থেকে উঠে এসেছে।

প্রতনু ভট্টাচার্য (সরকারী স্কুলের শিক্ষক): ২১ জুলাই দিনটি সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে এটাই বলব, শহিদদের মনে রাখতে তাদের জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা এটা তো খুবই ভালো ব্যাপার। তবে প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। এক্ষেত্রে যারা মহাসমারোহে দিনটি পালন করছে, তাদের কতজন কতটুকু জানে সেই শহিদদের সম্পর্কে? তাঁদের প্রতি আদতে কতটা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হয়ে থাকে আমি জানি না। তবে এটা বেশ বোঝা যায় ওই দিনটা অনেকের কাছেই একটা উৎসব উৎসব ব্যাপার। এগুলো তো সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্ট রিলেটেড। তাই কিছু স্বার্থ চরিতার্থ করার পরিকল্পনাও যে এই দিনটি উদযাপনে মাধ্যমে থাকে না তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

স্বপ্নময় গায়েন (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র): এই দিনটি পালন করা হয় একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। ব্যাপারটা কিন্তু সর্বজনীন নয়। এটা পালন করার মধ্যে কোথাও একটা লোক দেখানো বা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার প্রচেষ্টা আছে।

কলকাতা ৫

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৪ জুলাই ২০১৭

আমার চোখে কলকাতা

ডলি বসু (অভিনেত্রী)

প্রথম পাতার পর

আর একটা ব্যাপার, সেটা হল নিয়ম ভাঙার একটা প্রবণতা আমাদের মজ্জায় ঢুকে গেছে যেটা আগে ছিল না। এই যেমন হেলমেট পরবে না, হাজারো রকম সমস্যা। কত মানুষ রোজ মারা যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে। মুড়িমুড়কির মত প্রাণ যাচ্ছে তবু আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

আরেকটা মজার কথা হল, এখন বাঙালি ছেলেমেয়েরা বাংলা বলতে পারে না। তাই নিয়ে মায়েরা আবার গর্ব করে করে বলে ও না বাংলা বলতে পারে না, বাংলা লিখতে পারে না! এই কালচার তো বাঙালিদের মধ্যে ছিল না। এটা যে একটা খিচুরি কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রভাব আচার-ব্যবহার, সাজ-পোশাক, জীবনযাপনে পড়ছে। এটা খুবই কষ্ট দেয়।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ জুলাই ২০১৭

মায়ের ঘাট থেকে রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান ঘাট

নীহারিকা

কত দেশ, কত নগর, কত জনপথ যে আছে তার হদিশ কি আমরা জানি? সে সব অজানা, অপরিচিত দেশে নদ-নদীও নিশ্চয়ই আছে। আর আছে বিভিন্ন ঘাট। অবশ্য বর্তমানে আমরা শুধুই আমাদের প্রিয় কলকাতা মহানগরীর গঙ্গা-সংলগ্ন যেসব ঘাট আছে, সেগুলোর ইতিহাস এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে চর্চা করছি। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে হাঁটা শুরু করে এখন একেবারে উত্তরের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছি। এ হাঁটা একদিনের নয়, অনেকদিন ধরে চলছে। কিন্তু অজানা কথা জানার আগ্রহ আর মা গঙ্গার পবিত্র বাতাস কখনও মনে বা শরীরে ক্লান্তি জাগতে দেয়নি।

বাগবাজার থেকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ঘাট। এর আরেক নাম হল পাগলাবাবুর ঘাট। কে এই ব্যক্তি? খোঁজ করতে জানা গেল, তিনি ছিলেন কলকাতা শহরের ইংরেজের এক গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ান। বিত্তবান মানুষটির কিন্তু সবকিছু খোয়া যায় সুপ্রিম কোর্টের এক আদেশনামায়। এই ঘাটেই এক সময় বাগবাজারের উদ্বোধনের থাকালীন প্রায় প্রতিদিন ঘাটে শ্রীশ্রীমা সারদা আসতেন। তিনি ১৯০৯ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বছর নিয়মিত স্নান ও জপাদি করতেন। ২০০৫ সালে শ্রীমায়ের আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতা পুরসভা, তৎকালীন স্থানীয় সাংসদ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহায়তায় ঘাটের সংস্কার করা হয়। ঘাট সম্পূর্ণ সংস্কার ও ব্যবহার উপযোগী করে শ্রীশ্রীসারদামায়ের নামেই উৎসর্গীকৃত হয়। নতুন নামকরণ হয় মায়ের ঘাট। ২০০৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিশনের তৎকালীন সহাধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ নবনির্মিত ঘাটের উদ্বোধন করেন। গালিব স্ট্রিটের সংযোগস্থলে এসে পুল পেরিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে বরানগরের দিকে হাঁটলে পড়বে চিৎপুর ফুল ঘাট, হরি পোদ্দারের গাট, রানি দেবেন্দ্রবালার ঘাট ইত্যাদি। শেষের ঘাটটি তৈরি করা হয় রাজা গিরিশচন্দ্র সিংহের সহধর্মিণীর স্মৃতির উদ্দেশে। গিরিশচন্দ্র ছিলেন পাইকপাড়ারাজ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র।

মায়ের ঘাট

রতনবাবুর ঘাট

রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান ঘাট

পায়ে পায়ে এগোই। ব্যস্ত রাস্তা পার করে আরও এগোলে পড়ে কাশীপুরের রুস্তমজি ঘাট। মুম্বইয়ের পারসি বণিক রুস্তমজি কাউসি ব্যানাজির স্মৃতিতে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। পারসি এই ব্যবসায়ী ১৮০৯ সাল থেকে দীর্ঘদিন কলকাতায় বাস করেছিলেন। ১৮৫২ সালে এই শহরেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু রুস্তমজির ছিল জাহাজের কারবার। ব্যবসার সূত্রে একাধিকবার তিনি চিন দেশেও গেছেন। ১৮৩৯ সালে কলকাতার এক্সট্রা স্ট্রিটে তিনিই প্রথম অগ্নিদেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয়, রুস্তমজির হাতেই শহরের প্রথম জীবনবিমা দপ্তরের সূচনা হয়। অন্যদিকে আবার তিনি স্টিম নেভিগেশনের কাজও করেছিলেন।

এবার আমার শেষ গন্তব্য কাশীপুর মহাশ্মশান। এর আরেক নাম রতনবাবুর ঘাট। ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনরের উদ্যোগে ঘাটটি তৈরি হয়। মূলত হিন্দু সমাজের ব্যবহারের জন্য ঘাট নির্মাণের কারণে নড়াইলের জমিদার এখানকার জমি দান করেন। ঘাটের অপর পারে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠ। শ্মশানের পাশের ঘাট থেকে মঠে যাওয়ার নৌকা পাওয়া যায়। এটির নাম কুটিঘাট। এক সময় এই ঘাটে ব্যবসার কারণে ডাচ নৌবহর নোঙর করত। কাশীপুর শ্মশানে অতীতে বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তিকে দাহ করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী অভেদানন্দ, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি, গোপাল মা প্রমুখ। বর্তমানে শ্মশানঘাটের নতুন নাম হল রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান।

ফোটো: লেখিকা

সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মঙ্গলচিন্তক কলকাতা বেতার

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব-নয়

ছোটবেলায় ইতিহাসের পাতায় লিখতে হয়েছে ‘নীলনদের দান’ সম্পর্কে। ভূগোলে পড়তে হয়েছে আমার দেশ নদীমাতৃক দেশ। এই দেশের মাটি সব সময় উর্বর। একটা ঘাস জন্মাচ্ছে মানে ওই মাটিকে সঠিকভাবে তৈরি করে নিয়ে চাষের উপযোগ্য করে তোলা সম্ভব। বইয়ের পাতায় পড়ে, পরীক্ষার খাতায় লিখে নম্বর পেয়েই আমরা, বিশেষ করে শহুরেরা ক্ষান্ত থাকি। গ্রামের সেই মানুষগুলোর কথা, তাঁদের জীবনযাত্রার কথা আমরা জানতে চাই কি? প্রত্যন্ত গ্রামে আজও শিক্ষার আলো পৌঁছল না, তবু তাঁরা দেশের সবার জন্য ভাবছেন। গ্রাম-গঞ্জের মানুষ, চাষিভাই, শ্রমিকশ্রেণির মানুষের জন্য কলকাতা বেতার নানা অনুষ্ঠান অতীতেও করেছে এবং করে চলেছে আজও।

আমার বিশ্বাস, এইটুকু পড়ে পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই দুটো নাম ঝলক দিয়ে উঠল, ‘পল্লীমঙ্গল’ ও ‘মজদুরমণ্ডলী’। আজ এই দুটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের কথা বলব। বেতারের মূল শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে গ্রামের মানুষই বেশি। তাই সেই মানুষদের কথা ভেবে, শুধুমাত্র তাঁদের জন্যই অনেকদিনের চেষ্টায় প্রস্তুত হয় পল্লীমঙ্গল। গ্রামের মানুষদের কাছে শিক্ষার আলো যেহেতু পৌঁছয়নি, তাই গান, নাটক এইসবের মাধ্যমে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছে বেতার। চাষ-সংক্রান্ত নানা তথ্য, সার, নতুন প্রযুক্তি— এই সব বিষয়ে নানা খবর আজও আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত হয়। বেতার কর্তৃপক্ষ বুঝেছিলেন বর্ণজ্ঞান নেই যাঁদের, তাঁরা শুনেই শেখে। তাই বিভিন্ন তরজা, পাঁচালি গানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ‘পল্লীমঙ্গল’। আরও একটি ভাবনা কাজ করেছিল এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পেছনে। যেহেতু গ্রামের মানুষ রেডিও বেশি শোনে, তাই প্রতিটি গ্রামের, প্রতি ঘরে রেডিও সেট পৌঁছে দিতে গ্রামের মানুষদের মঙ্গল কামনায় তৈরি হয়েছিল ‘পল্লীমঙ্গল’।

জনশিক্ষার বাহন হিসাবে বেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে। বর্তমান সময়ে তাঁর জনপ্রিয়তা কমলেও একটা সময় ছিল নানা স্তরের মানুষ রেডিওর নানা অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতেন। তেমনই এক অনুষ্ঠানের নাম মজদুরমণ্ডলী। ইংরেজ আমলেই এই অনুষ্ঠানের সূচনা। সেই সময় সারা ভারত জুড়ে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। ভারতের তখনকার শ্রমিক সমাজও সেই আন্দোলনের অংশ ছিলেন। সত্যচরণ ঘোষ এক জায়গায় লিখছেন, ‘পরাধীন ভারতের জনমনে এক বিক্ষুব্ধ ভাব, শ্রমিক সমাজও বিক্ষুব্ধ। উৎপাদন ব্যাহত। ইংরেজ সরকার চিন্তিত, কী করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ...উৎপাদন তরান্বিত না হলে যুদ্ধে চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়।’ সেই সময় শ্রমিকদের আগ্রহ বাড়াতে বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান চালু করা হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহে তিনদিন এই মজদুরমণ্ডলী প্রচারিত হতা। শ্রমিকদের জন্য গানের প্রচারই ছিল বেশি। ক্রমে গানের পাশাপাশি যুদ্ধের সময়োপযোগী নাটক এবং যুদ্ধজয়ে শ্রমিকদের ভূমিকা সম্পর্কিত নাটক প্রচারিত হতে থাকে।

দেখা যাচ্ছে, এই অনুষ্ঠান প্রথমদিকে উর্দুভাষায় সম্প্রচারের ফলে বাংলা ও হিন্দিভাষী শ্রমিকেরা এই অনুষ্ঠানের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তবে একেবারে শ্রমিকেরা যে উপকৃত হতেন না, তেমন নয়। দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এল। স্বাধীন ভারতের নেতৃবর্গ শ্রমিকদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রয়েছে তা উপলব্ধি করলেন। তাই শ্রমিকদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বেতারে উর্দুভাষার পরিবর্তে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় একই সময়ের মধ্যে ১৯৪৯ সাল থেকে ২০ মিনিটের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। এরপর আস্তে আস্তে এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে হিন্দি ও বাংলা ভাষায় এই অনুষ্ঠান আলাদা আলাদা করে প্রচারিত হতে শুরু করল।

ভারতের সর্বত্রই একসঙ্গে শিল্পবিপ্লব এবং শ্রমিক কল্যাণের সন্ধিক্ষণে মজদুরমণ্ডলীর পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হলেন সত্যচরণ ঘোষ। সালটা ১৯৬০। সেই সময় শ্রমিকমহলে যে পরিবর্তন এসেছে, সারা ভারত জুড়ে ভারী, মাঝারি, ক্ষুদ্রশিল্পের যে প্রসার ঘটেছে, শ্রমিকদের জন্য যেসব মঙ্গলকেন্দ্র খোলা হয়েছে তাদের খবর, ঘড়ি ধরে প্রচারিত হতো মজদুরমণ্ডলীতে। এই অনুষ্ঠানেই থাকত ‘কারখানায় একদিন’ কিংবা ‘শ্রমিক মঙ্গলকেন্দ্রে একদিন’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান। সত্যচরণ ঘোষ এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়ে একে শ্রমিকের আরও কাছাকাছি করে তুললেন। কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যে একটু গান, আবৃত্তি, সাক্ষাৎকার, কথিকা সব মিলিয়ে তেমন ভাবে ঠিক জমছিল না। অনেকটা গতানুগতিক হয়ে পড়ছিল। তাই সত্যচরণবাবু তৎকালীন প্রোগ্রাম এগজিকিউটিভ সুধীন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব রাখেন প্রতিটি বিষয় নিয়েই এক-একটি পর্ব করা হোক। তবেই শ্রমিকরা আরও উৎসাহ পাবে। সময় সংকটের কথা সুধীনবাবু বললে, সত্যচরণবাবু বলেন, ‘রবিবারের গীতবিচিত্রা অনুষ্ঠানে শুধু গ্রামোফোন রেকর্ড শোনানো হয়, আর সেসব অতি পুরনো।’ সেইমতো গীতবিচিত্রা বন্ধ করে কারখানা বা শ্রমিক মঙ্গলকেন্দ্র থেকে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও পরিচালনায় গান এবং সংগীতরূপক কিছু রেকর্ড করে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন তিনি। সুধীনবাবু সেই সব প্রস্তাবে রাজিও হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আপনার সঙ্গে আমি একমত। জনপ্রিয় করার এটাই ভালো পথ। তাহলে আপনি আমাকে এ সম্পর্কে একটি প্ল্যানিং করে দিন।’

এই সময়ই দিল্লি কেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী ‘পল্লীমঙ্গল’ ও ‘মজদুরমণ্ডলী’ অনুষ্ঠানে ‘টপিক ফর টুডে’ শীর্ষক স্ক্রিপ্টের বাংলা অনুবাদ প্রচারিত হতে শুরু করে, যার নাম ছিল ‘আজকের কথা’। এই আজকের কথায় বহু বিষয় যা শ্রমিকদের প্রয়োজন, তার প্রচার এবং শিল্প ও শ্রমকল্যাণ সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকে। এক শনিবার অন্তর মজদুরমণ্ডলীতে ‘শ্রমিকের শপথ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের চিঠির উত্তর দেওয়া হতো। তেমনই এক চিঠি প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণায় সত্যচরণবাবু বলছেন, ‘শ্রোতাদের কাছ থেকে কয়েকটি পত্রে প্রশ্ন পেলাম, ওয়ান ডে স্কুলের সার্থকতা কী? এতে শ্রমিকদের শিক্ষার দিক থেকে কিছুই হয় কি? এ বিষয়ে পরিচালকের বক্তব্য কী?’ এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, ওয়ান ডে স্কুলের সার্থকতা নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু তা কতটুকু সেটি ওয়ান ডে স্কুলের কার্যক্রম রেকর্ড করে এনে প্রচার করলেই বোঝা যাবে। সেই কথামতো ১৯৭০ সাল থেকে প্রতি মাসে ‘শ্রমিক শিক্ষার ক্লাস’ মজদুরমণ্ডলীর আসর থেকে প্রচারিত হতে শুরু করে। এছাড়াও শুরু হয় ‘শিল্পতীর্থ’ নামক একটি বিভাগ, যেখানে পর্যায়ক্রমে এক একটি শিল্প-প্রকল্পের অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে শুরু করে।

এইভাবেই নতুন নতুন ভাবনায় ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সত্যচরণ ঘোষ মজদুরমণ্ডলী নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন এবং সফলও হয়েছেন। আজও আকাশবাণী এবং দূরদর্শন গ্রামের মানুষদের জন্য, কৃষিভাইদের জন্য, শ্রমিকদের জন্য তথ্য ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে চলেছেন। ছোট্ট করে আরও একটি কথা বলে শেষ করব আজকের পর্ব। ‘পল্লীমঙ্গল’ এবং ‘মজদুরমণ্ডলী’ দুটি অনুষ্ঠানের সিগনেচার টিউন তৈরি করেছিলেন স্বয়ং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। শুধু এই দুটি নয়, বেতারের অনেক অনুষ্ঠানেরই সিগনেচার টিউন তিনি বানিয়েছিলেন। সেই বিষয়ে অন্যপর্বে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

নিঃশ্বাসে কেঁপে ওঠে গাছের পাতা

সোমনাথ আদক ও তন্ময় মণ্ডল

এখানে রাত হয় না, রাত আসে সারি-সারি, লম্বা-লম্বা গাছের ভেতর দিয়ে। বাতাসের সড়সড় শব্দ আর নিস্তব্ধ রাতে পায়রার হাড়হিম করা ডাকে অন্ধকার গাঢ় হয়। সে যেন এক অন্য পৃথিবী। কলকাতার মধ্যে থেকেও যেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে। যেখানে জিগজ্যাগ আলোর ম্যাজিক নেই, এয়ার হর্নে গাড়ির রেষারেষি নেই, কোলাহল নেই। সময় যেন এখানে থমকে আছে বছরের পর বছর। ইতিহাস এখানে ধুলো আর শ্যাওলার স্বেদ নিয়ে যেন চলমান বর্তমান। আবছা অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালের মাঝখানে সরু পথ দিয়ে হেঁটে গেলে দু'পাশে ধুলো আর শুকনো পাতায় ঢেকে রাখা সমাধি। যেখানে শুকনো পাতার খসখস শব্দে নিজের পায়ের শব্দকেও অচেনা মনে হয়। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দেও যেন কেঁপে ওঠে বুকের ভেতরটা। হ্যাঁ, খাস কলকাতার বুকে এমনই একটি জায়গা হল সাউথ পার্ক স্ট্রিট সেমিট্রি।

অনুমান করা হয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কলকাতার বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোডের (বর্তমানে মাদার টেরজা সরণী) এই সিমেট্রিটিই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও প্রথম নন চার্চ কবরখানা। জায়গাটি আগে ছিল জঙ্গল আর জলাভূমি। কথিত আছে, লর্ড ক্লাইভ এখানে বাঘ শিকার করতেন। ১৭৬৭ সালে এই কবরখানাটি চালু হয়। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, স্যার এলিজা ইম্পে, উইলিয়াম জোন্স, চার্লস স্ট্যুয়ার্ট, এলিজাবেথ জেন বারোয়েল সহ ১৭০০ ইউরোপিয়ানের সমাধি আছে আট একর এই কবরখানায়। এর মধ্যে ১৭৬৮ সালে সমাধিস্থ ১৯ বছরের সারা পিয়ারসনের সমাধিকে সবচেয়ে পুরনো বলে মনে করা হয়। আবার এখানেই এমন অনেক সমাধি আছে ইতিহাসের গর্ভ থেকে মুছে গেছে যাদের নাম। বহু বছরের জমা ধুলো আর পুরু শ্যাওলা জমা এপিটাফগুলোকে শতবার রুমাল দিয়ে মুছেও জানতে পারা যায় না তাদের পরিচয়। শুধু ব্রিটিশদের সো কল্ড ক্লাসিক অ্যান্ড এক্সেলেটিক স্টাইলের গথিক ও ইন্দো-সারসেনীয় শিল্পের স্থাপত্য নিয়ে স্মৃতি হিসাবে আজও রয়ে গেছে তাদের ওবেলিস্ক, মসোলিয়াম আর ওলের ডোলনাগুলি।

১৮৩০ সালে এই কবরখানাটি পুরোপুরি বন্ধ হলেও এর মূল ফটকের পাশে শ্বেত-পাথরের ফলকে লেখা আছে 'সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রি, ওপেন্ড- ১৭৬৭, ক্লোজড- ১৭৯০'। আসলে ১৭৯০ থেকে খাটি ইউরপীয়ানরা এই কবরখানা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অ্যাংলো আর বাঙালি খ্রিস্টানরা ১৮৩০ সালে এখানে কবর দেওয়া বন্ধ করে, কিন্তু এই কবরখানাকে ঘিরে প্রচলিত আছে নানা অলৌকিক কাহিনি।

শোনা যায় রাত এলেই নাকি পালটে যায় এই সেমিট্রির রূপ। আশা-আকাঙ্ক্ষা আর না পূরণ হওয়া চাহিদা নিয়ে শতাধিক বছরের পুরনো কবরের নীচ থেকে কফিনের ডালা খুলে উঠে আসে সব অতৃপ্ত আত্মা। তাদের নিঃশ্বাসে কেঁপে ওঠে গাছের পাতা। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সড়সড় শব্দ। নিস্তব্ধ নিঝুম অন্ধকারে, নির্জন কবরখানায় ভেসে বেড়ায় ফুলের গন্ধ, ধুপের সুবাস। টের পাওয়া যায় তাদের পায়ের আওয়াজ, কথার ফিসফিসানি। কবরের পাশে কে যেন কাঁদে। কে যেন গুন গুন করে গান করে। কে যেন আজও শুকনো পাতার ওপর ভারী বুটের আওয়াজ তুলে রুটমার্চ করে এই অন্ধকার নির্জন কবরস্থানে। সাদা অথবা ফিকে রঙের পোশাক পরে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা নাকি এখানে ঘুরতে দেখা যায় কোনও এক সুন্দরী মহিলাকে।

এরা কারা? না, জানা যায়নি। শুধু ইতিহাসের কিছু ইঙ্গিত ধরে অনুমান করা হয়, যে শুকনো পাতার ওপর ভারী বুটের আওয়াজ তুলে রুটমার্চ করে ও আসলে সেই ১৭ বছরের ব্রিটিশ সৈনিক। যে নিজের দেশ থেকে, আত্মীয়-পরিজনের থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে একটা অজানা দেশে, কিছু অপরিচিত মানুষের মাঝে মারা গিয়েছিল। কবরের পাশ থেকে যে কান্নার আওয়াজ আর গুনগুন গান ভেসে আসে তা কোনও এক মা ও তার সন্তানের। ওখানেই নাকি মা ও তার ছোট্ট সন্তানটিকে একই সাথে কবর দেওয়া হয়েছিল। আর ওই যে সাদা বা ফিকে রঙের পোশাক পরা মহিলাকে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা যাকে ঘুরতে দেখা যায় কেউ মনে করে সে আসলে, সেই তৎকালীন পরমা সুন্দরী এলিজাবেথ জেন বারয়েল। যিনি তার ১৬ জন রূপানুরাগীকে নানাভাবে হয়রান করে আনন্দ পেতেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে মারা যান তিনি। রূপ ও যৌবনের জ্বালা নিয়ে আজও ঘুরে বেড়ায় তার অতৃপ্ত আত্মা। আবার কেউ কেউ মনে করে ওই অশরীরী মহিলাটি আসলে সেই নামহীনা, পরিচয়হীনা 'আ ভারচুয়াল মাদার' লেখা ৩৬৩ নম্বর সমাধির মালকিন। শোনা যায় প্রিয়জনের কবরে ফুল দিতে এসে হঠাৎই মাথা ঘুরে পড়ে গেছে কেউ। ক্যামেরায় ধরা পড়েছে কিছু অদ্ভুত ছায়ামূর্তি। একবার তো ঘটেই গেল দুর্ঘটনা। সন্দীপ রায় পরিচালিত 'গোরস্থানে সাবধান' ছবির শ্যুটিং-এর জন্য এই সিমেট্রির দরজা খোলা হলে তখনি ওলোট-পালোট হয়ে গেল শ্যুটিং-এর সেটে থাকা সবার মন। অদ্ভুত সব শব্দ আর ছায়ার ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠল সবাই। তবে কি এটা কোনও আত্মারই কাজ। তারা কি চায় না চিরনিদ্রায় শায়িত তাদের নিজস্ব পৃথিবীতে অন্য কেউ প্রবেশ করুক? কৌতূহলী মনুষের মনে প্রশ্ন আছে অনেক, কিন্তু উত্তর নেই।

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২৪ জুলাই ২০১৭

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ - ২২৪১৯০১, ২২৪১৪৯০৪

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২৪ জুলাই ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

আছে পুরনো আর নতুনের মেলবন্ধন

সালেক মাহমুদ (চিত্রশিল্পী)

কলকাতার কথা লিখতে বসলে ভাবতে হয় কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব, কলকাতা এমনই একটা শহর। কলকাতা শহরের একটা আলাদা মাধুর্য আছে। একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। কলকাতার মধ্যে আছে পুরনো আর নতুনের মেলবন্ধন।

আমি প্রথম কলকাতা যাই খানিকটা বিপাকে পড়েই। ডাক্তার দেখাতে। যদিও তার আগে বহুবার কলকাতায় বিভিন্ন এগজিবিশনে যাবার সুযোগ এসেছিল। যাই হোক প্রথমবারে অসুস্থতার জন্য আমি খুব একটা ঘুরে দেখতে পারিনি শহরটাকে। দিন পনেরো ট্রিটমেন্ট চলার পর আবার ফিরে এসেছিলাম নিজের শহর ঢাকায়। তবে যতটুকু দেখেছিলাম, তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমাকে আবার আসতে হবে এই শহরে। সেই অমোঘ টান অস্বীকার করার ক্ষমতা আমার ছিল না। ফের বছর দুই বাদে এলাম কলকাতায়। কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে একটা এগজিবিশনে। ঠিক করেই নিয়েছিলাম এবার এ-শহরের নাড়ি-নক্ষত্র না দেখে ফিরব না। তাই হাতে পর্যাপ্ত সময়ও নিয়ে এসেছিলাম। এবারে এসে আমাদের পাঁচজনের টিম উঠলাম মারকুইস স্ট্রিটের বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা হোটেলে। হোটেলের নামটা মনে নেই, তবে হোটেলের ম্যানেজার মাসুদ ভাইকে আজও মনে আছে। কারণ অচেনা শহরে তিনি আমাদের জন্য যা করেছিলেন ভাবা যায় না। পুরো শহর ঘুরে দেখানোর জন্য একটা লোকও ঠিক করে দিয়েছিলেন মাসুদ ভাই।

প্রথমদিন অ্যাকাডেমিতে হয়ে গেল দুই বাংলার শিল্পীদের এগজিবিশন। প্রচুর মানুষ দেখতে এসেছিলেন সেই এগজিবিশন। এর পরের দিন থেকেই শুরু হল আমাদের কলকাতা ঘোরা। যে-ভাই আমাদের কলকাতা দেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিল তার নাম রাজু। আমাদের কলকাতা দেখা শুরু হল উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে। এখানের রাস্তাগুলো বড় অদ্ভুতরকম। রাস্তার মাঝখানে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বোসের ঘোড়ায় চড়া মূর্তি চার-পাঁচটা রাস্তার সংযোগস্থলের মাঝে রাখা। এই মূর্তি দেখে এখানে নতুন আসা যে কেউ রাস্তা ঠিক করতে পারে। এখানকার দোকানপাট বা বিল্ডিংগুলো দেখে পুরাতনের ঐতিহ্য খুব ভালোভাবে টের পাওয়া যায়। এরপর গেলাম শোভাবাজারের রাজবাড়ি। রাজুর মুখ থেকে শুনছিলাম এখানকার ঐতিহ্যের কথা, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের কথা পুরনো কলকাতার ইতিহাসের কথা। সেসব দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। সন্ধেবেলা আরও কয়েকটা জায়গা ঘুরে বাগবাজারের ঘাটে গিয়ে বসলাম আমরা। গঙ্গার পাড়ে বাগবাজার রেলস্টেশন। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। মন যেন কী এক স্নিগ্ধতায় ভরে যাচ্ছিল গঙ্গার আবহে। সেখান থেকে গেলাম ওখানকার নাম করা দোকান মিত্র ক্যাফেতে খেতে। বেশ সুন্দর সুন্দর খাবার আইটেম। সেখান থেকে ফিরলাম নিউ মার্কেটে। মার্কেটিং করলাম। এত সমৃদ্ধ জামাকাপড়ের বাজার আমি খুব কম দেখেছি। পরের দিন ভিক্টোরিয়া, তারামণ্ডল দেখলাম। সেখান থেকে ময়দানে বসে ঝাল-মুড়ি খেতে খেতে শুরু হল আড্ডা। সন্ধের ময়দান চত্বর এক কথায় অসাধারণ। ভাষায় তার বর্ণনা করা অসম্ভব। আমরা ফিরে এলাম সেদিনের মতো হোটেলে। পরের দিন কেউ বেরোতে চাইল না কারণ রাতে আমাদের ফিরতে হবে। আমি বেরোলাম ওই পাঁচজনের এক বন্ধুকে নিয়ে। সোজা কলেজ স্ট্রিটে। ওখানে গিয়ে এটা মনে হয়েছিল যে এই জায়গায় না আসলে কলকাতা দেখা অসম্পূর্ণ। কফি হাউসে গেলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চা খেলাম। সেসব স্মরণীয় মুহূর্ত আজও অমলিন। পেরিয়ে গেছে পাঁচটা বছর তবু আমার মনে জলজ্যান্ত সেইসব স্মৃতিগুলো।

সংগীতশিল্পী ও সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস

হৃদয় মালাকার

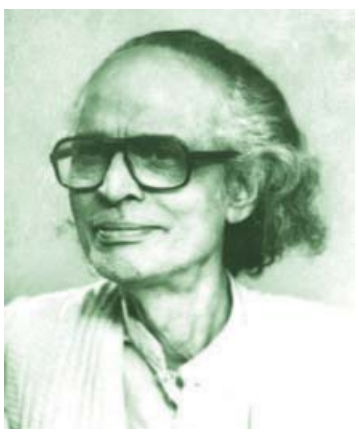

হৃদয়ের প্রতিবাদীমনস্ক, সংগীতশিল্পী ও সুরকার হিসাবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সমাদর প্রত্যেকটি সংগীতপ্রিয় মানুষের কাছে। মূলত লোকসংগীতকে কেন্দ্র করে গণসংগীত রচনার ক্ষেত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অবদান অসামান্য।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটের মিরাশি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হবিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে পাশ করে শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই সূচনা সংগ্রামী জীবনের। ১৯৩২ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। এরপর পার্টি ও নিজের চেষ্টায় হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবী। বিপ্লবী চিন্তা-ভাবনা তাঁর শিল্পীজীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামী চিন্তা-ভাবনার জন্য ১৯৩৫ সালে তাঁকে কারাবন্দি হতে হয়। জেলে থাকাকালীন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে যাদবপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন এবং সে কারণেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময়ে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন এবং তিন বছর কারাবন্দির নির্দেশ হয়।

১৯৩৮-১৯৩৯ সালে বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সাথে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই.পি.টি.এ গঠন করেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ অবধি তিনি এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের আমন্ত্রণে তিনি প্রথম বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আসেন সংগীত পরিবেশন করতে। ১৯৪৩ সালে তাঁর উদ্যোগে এবং জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়ালের সহযোগিতায় সিলেটে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গানের সুরকারদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান। সেই সময়ে তাঁর গান 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান', 'কিষাণ ভাই তোর সোনার ধানে বর্গী নামে' প্রভৃতি অসম ও বাংলায় সাড়া ফেলেছিল। অসমে তাঁর সহযোগী ছিলেন বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, সাহিত্যিক অশোকবিজয় রাহা, সেতারবাদক কুমুদ গোস্বামী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৯৫৬ সালে চিনে যান চিকিৎসার জন্য। এরপর আড়াই বছরের অভিজ্ঞতায় চিনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। কলকাতার তৎকালীন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মুগ্ধ হয়ে ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ থেকে স্থায়ীভাবে চলে আসেন কলকাতায় এবং সেই সময়েই চাকরি নেন সোভিয়েত কনস্যুলেটের সোভিয়েত দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সম্পাদকীয় দপ্তরে কাজ করার সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হলে তিনি কাজ ছেড়ে দেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নয় বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন ও উদারমনস্ক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি দু'বার চিনে গিয়েছিলেন। এরপর চিনা সংস্কৃতির উপর আকৃষ্ট হয়ে চিনা ভাষায় তিনি অনেক গানও রচনা করেছেন। সেগুলো একসময় তুমুল ইতিবাচক সাড়া ফেলেছিল।

সংগীতকে কেন্দ্র করেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। শেষ জীবন পর্যন্ত সংগীতকেই সঙ্গী করেছেন। ১৯৭১ সালে 'মাস সিঙ্গার্স' নামে নিজের দল গঠন করেন। জীবনের শেষ দিকেও তিনি গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি কল্লোল, তীর, লাললণ্ঠন প্রভৃতি নাটকের সংগীত পরিচালকও ছিলেন। 'লাললণ্ঠন' নাটকে তিনি বিভিন্ন চিনা সুর ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়া রাশিয়ান গানের অনুবাদ করে সংগীতের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন তিনি।

তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'শঙ্খচিলের গান', 'জন হেনরীর গান', 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য', 'বাঁচব বাঁচব রে মশাল জ্বালো', 'সেলাম চাচা', 'আমি যে দেখেছি সেই দেশ', 'হবিগঞ্জের জালালি কইতর' ইত্যাদি। তাঁর রচিত গান নিয়ে 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান এবং শঙ্খচিলের গান' নামক গানের সংকলন প্রকাশিত হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বাংলা ও অসমে সমান সমাদৃত। তিনি অসমিয়া ভাষায়ও বহু গান রচনা করেন। বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় তাঁর লেখা গ্রন্থ— লোকসংগীত শিক্ষা, কুল খুরার চোতাল, আকৌ চীন চাই আহিলো, জীবন শিল্পী জ্যোতি প্রসাদ, লোকসংগীত সমীক্ষা বাংলা ও আসাম, উজান গাঙ বাইয়া, হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনাবলী ইত্যাদি। কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে অনেক গান, অনেক সুর। তবু আজকেও সমান প্রাসঙ্গিক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি।